নতুন তীর্থ

শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলিধন্য গৌরহাটি

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গৌরহাটি—হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার একটি গ্রাম—আরামবাগ থেকে বন্দর সড়কপথে তেরো কিলোমিটার দূরে। গৌরহাটির প্রধান বিশেষত্ব হল, শ্রীরামকৃষ্ণদেব অন্তত একবার (মতান্তরে দুবার) এখানে এসেছিলেন। পরবর্তী কালে এই গ্রামে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ছোট অথচ সুন্দর মন্দিরে রয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মর বিগ্রহ। তবুও স্থানটি কিন্তু তেমনভাবে আলোচিত নয়। দুই প্রধান রামকৃষ্ণ-সাহিত্য 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে' এই গ্রামের উল্লেখ আছে।

রামকৃষ্ণদেবের ছোট বোন সর্বমঙ্গলার বিয়ে হয়েছিল এই গ্রামে। লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দজী লিখেছেন, ''মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর এখন দ্বাবিংশতি বর্ষে এবং কনিষ্ঠা ভগিনী সর্বমঙ্গলা নবমে পদার্পণ করিল। শ্রীযুক্ত রামকুমার রামেশ্বরকে বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া কামারপুকুরের নিকটবর্তী গৌরহাটি নামক গ্রামের শ্রীযুক্ত রামসদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগিনীর সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন এবং রামসদয়কে নিজ ভগিনী সর্বমঙ্গলার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলেন।''[১]

১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে রামেশ্বরের সঙ্গে শাকম্ভরী দেবীর এবং সর্বমঙ্গলা দেবীর সঙ্গে রামসদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ সম্পন্ন হল। এতে কোনও পক্ষকেই পণ দিতে হয়নি। এই দুই বিবাহের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের গৌরহাটিতে আগমন হয়েছিল। সন, তারিখ জানা না গেলেও তখন তাঁর বাল্যকাল। ''গদাধর একবার গৌরহাটী গ্রামে গিয়া দেখেন তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী প্রসন্নমুখে নিজের স্বামীর সেবা করিতেছেন। দৃশ্যটি তাঁহার হৃদয়গ্রাহী হওয়ায় বাড়িতে ফিরিয়া স্বামিসেবানিরতা নিজের ভগিনীর একখানি ছবি আঁকিয়াছিলেন। উহাতে সর্বমঙ্গলার ও তাঁহার স্বামীর চেহারার সৌসাদৃশ্য দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন।''[২]

যে-বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন, সর্বমঙ্গলার শ্বশুরবাড়ির সেই ভিটের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে এখনও। তবে কতদিন তা রক্ষা পাবে বলা কঠিন। প্রতি বছরই বর্ষার জলধারায় মাটির দেওয়াল ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। বন্দ্যোপাধ্যায়দের এই ভিটে রামলাল, শিবরাম ও লক্ষ্মীমণি দেবীর একদিকে

শিক্ষক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আই টি আই, আসানসোল। সম্পাদক, বিবেকবার্তা।

সর্বমঙ্গলার ভিটা

মামাবাড়ি, আবার পিসির বাড়িও। তাঁরা প্রায়শই শাকম্ভরী দেবীর সঙ্গে মাতুলালয়ে যেতেন। অনুমান করতে অসুবিধা নেই শ্বশুরবাড়ি হওয়ার সুবাদে অবশ্যই রামেশ্বরও এই ভিটায় হয়তো একাধিকবার এসেছেন। বর্তমানে এই পতিত ভূখণ্ড আগাছায় ভরা, এখানেই খোলা আকাশের নিচে রয়েছে স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গের মাথায় আচ্ছাদন দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়েছে, কিন্তু রাখা যায়নি—কখনও ঝড়ে উড়ে গেছে, কখনও অন্যভাবে নষ্ট হয়েছে। বরং যাঁরা সে-প্রচেষ্টা করেছেন তাঁদের অনিষ্ট হয়েছে বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন।

গৌরহাটি একটি অত্যন্ত প্রাচীন গ্রাম। বহু প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আজও এখানে বর্তমান। গ্রামে রয়েছেন গৌরীবুড়ি মা। অরন্ধনের সময় সেবাইতদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মা সেবা নেন। কারও কারও মতে এই দেবীর নাম থেকেই গ্রামের নাম গৌরহাটি। গৌরহাটিতে শিবমন্দির, কালীমন্দির, নারায়ণমন্দির, ধর্মঠাকুরের মন্দির, রামগোপালজিউ মন্দির সহ অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির রয়েছে। সর্বমঙ্গলার ভিটের কাছাকাছি রয়েছে অতিপ্রাচীন শান্তিনাথ শিবমন্দির। শিবরাত্রিতে মন্দির প্রাঙ্গণ উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। লোকশ্রুতি, পুরী যাওয়ার পথে মহাপ্রভু এই গ্রামে একরাত্রি ছিলেন। যেখানে তিনি রাত্রিবাস করেছিলেন, সেই মহাপ্রভুপাটে আজও দোলপূর্ণিমায় বর্ণময় উৎসব হয়, হরিনাম সংকীর্তনের আসর বসে।

গ্রামের অন্যপ্রান্তে রামগোপালজিউ-এর মন্দির। সুন্দর মন্দিরে রামগোপালজিউ ছাড়াও পাঁচমূর্তি শালগ্রাম শিলা রয়েছে। এখানে দোলপূর্ণিমা ও রথযাত্রায় বড় উৎসব হয়। গৌরহাটির রথের মেলা এক সময় বিখ্যাত ছিল। এখন কিছুটা ম্লান। তবে ২০২২ সাল থেকে মঠে শুরু হয়েছে রথ উৎসব। শুধুমাত্র গ্রামবাসীরাই নন, আশেপাশের গ্রামগঞ্জের মানুষজনও এই উৎসবে যোগ দিয়ে মঠের রথযাত্রাকে সর্বজনীন করে তুলেছেন। মঠের পাশেই রয়েছেন সিদ্ধেশ্বরী কালী মা। রাধারপাড় মহাশ্মশানে প্রায় একশো ত্রিশ বছর আগে জনৈক কেষ্টসাধু স্বপ্নাদেশ পেয়ে করালবদনী রূপে মাকে প্রতিষ্ঠা করেন। গৌরহাটি গ্রামের রামময় চট্টোপাধ্যায়ের বাসগৃহে এক সময় একটি আবাসিক চতুষ্পাঠী ছিল। সেই পরিবারের বংশধরদের কাছে বর্তমানে মূল্যবান দুটি প্রাচীন পুঁথি সযত্নে রক্ষিত রয়েছে। একটি সম্পূর্ণ, অন্যটি অংশবিশেষ। হয়তো চতুষ্পাঠীতে এই পুঁথি পড়ানো হত। গৌরহাটি গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে রয়েছে অনেক ইতিহাস, অনেক অজানা কাহিনি। অনেক বড় গ্রাম গৌরহাটি। একটি উদাহরণই যথেষ্ট—গ্রামে নয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা দুটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

বর্ধিষ্ণু এই গ্রামটির মানুষজনের একসময় প্রধান জীবিকা ছিল তাঁত বোনা ও কৃষিকাজ। এছাড়া কুমোর এবং কর্মকাররাও ছিল অনেক ঘর। এখানকার তাঁতবস্ত্রের বেশ সুনাম ছিল। আর কর্মকারদের তৈরি তালাচাবির চাহিদা ছিল দূরদূরান্তেও। বর্তমানে তাঁত রয়েছে মাত্র দু-চারটি পরিবারে, তালাও আর তৈরি হয় না। গ্রামের মানুষ

কৃষিকাজ ও অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

গৌরহাটির গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে এখানে রামকৃষ্ণ আশ্রম গড়ে ওঠায়। ১৯৭১ সালে কয়েকজন ভক্তের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় গ্রামের শ্মশানের একপাশে একটি পর্ণকুটির নির্মাণ করে শ্রীরামকৃষ্ণের পট স্থাপন করে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। কিছুদিন পর সংলগ্ন কিছুটা জমি পাওয়া যায়। মন্দির নির্মাণের কাজও শুরু হয়। পরে অর্থাভাবে কাজ থেমে যায়। ১৯৭৮ সালে দ্বারকেশ্বর নদে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের কারণে বন্যা দেখা দিলে বেলুড় মঠ থেকে বালি-দীঘরা গ্রামে রিলিফের কাজ তদারকি করতে আসেন মঠ-মিশনের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ এবং সহকারী সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দ মহারাজ। আশ্রম কমিটির সদস্যদের আমন্ত্রণে তাঁরা গৌরহাটি আশ্রমে আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে, গম্ভীরানন্দজী আত্মস্থানন্দজীকে সম্বোধন করে বলে ওঠেন, ''সত্যকৃষ্ণ, ঠাকুর প্রকট হয়ে এখানে বসে আছেন।''[৩] ওইসময় বিমল নাথ নামে এক ভক্তকে গম্ভীরানন্দজী এই আশ্রমের জন্য কিছু করার নির্দেশ দেন। সেই ব্যবসায়ী ভক্ত পরবর্তী কালে আশ্রম নির্মাণের অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করেন। এছাড়া গ্রামের বর্ধিষ্ণু ও সম্ভ্রান্ত সিংহরায় পরিবার বেশ কিছু জমি ও পুকুর দান করেন। অন্যেরাও কিছু কিছু জমি দান করেন এবং আশ্রমের পক্ষ থেকেও কিছু জমি ক্রয় করার পর বর্তমানে দুটি পুকুর সহ মঠের মোট জমির পরিমাণ ৫.২৫ একর।

রামকৃষ্ণ মঠ, গৌরহাটি

১৯৮৬ সালের ১২ মে অক্ষয়তৃতীয়ার দিন নব নির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ। ১৯৮৭ সালের ১১ জুন স্নানযাত্রার দিন মন্দিরে ঠাকুরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। ২০০৯ সালের ১০ এপ্রিল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী প্রমেয়ানন্দজী এবং সাধারণ সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দজীর উপস্থিতিতে বেলুড় মঠ এটি অধিগ্রহণ করে; এটি নিকটস্থ ময়াল-ইছাপুর মঠের উপকেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত হয়। উল্লেখ্য, ময়াল-ইছাপুর হল শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ শশী মহারাজ অর্থাৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর পুণ্য জন্মস্থান, যেখানে ১৯৯৪ সালে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। গৌরহাটি থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরের ময়াল-ইছাপুরও এক পবিত্র ও দর্শনীয় স্থান। শশী মহারাজের আবির্ভাবতিথি পালন এখানে উৎসবের চেহারা নেয়। ২০০৯ সালে ময়াল-ইছাপুরে নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষ আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

'রামকৃষ্ণ মঠ, গৌরহাটি' ২০১২ সালের ১ এপ্রিল রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়ের স্বতন্ত্র শাখাকেন্দ্ররূপে স্বীকৃতি পায়। বহু প্রাচীন সাধুর পদধূলিধন্য এই মঠে নিত্যপূজা, প্রার্থনা, শাস্ত্রালোচনা, ঠাকুর, মা, স্বামীজীর তিথিপূজা, রথযাত্রা উৎসব, গদাধর অভ্যুদয় প্রকল্প, দাতব্য চিকিৎসালয় সহ সারা বছর ধরে নানা সেবাকাজের কর্মসূচি পালিত হয়। মঠে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত সাহিত্যের বিপণন কেন্দ্রও রয়েছে।

আরামবাগের গৌরহাটি মোড় হয়ে গৌরহাটি

গ্রামে যেতে হয়। গৌরহাটি মোড়ের কাছাকাছি ডিহিবায়রা গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে রয়েছে শক্তিসাধক রণজিৎ রায়ের বিশাল দিঘি। দিঘিটি প্রায় সারাবছরই পদ্মলতায় ভরে থাকে। কিন্তু মাঝখানটি সর্বদা ফাঁকা, স্থানীয় মানুষের কথায়, ওইখানেই ডুব দিয়েছিলেন রণজিৎ রায়ের কন্যারূপী দেবী ভগবতী। দৈবী লীলার এই দিঘির প্রান্তরে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে একমাস ব্যাপী আমবারুণীর মেলা হয়। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষজন বিশেষ করে কাঠের জিনিসপত্র কেনার জন্য মেলায় আসেন।

ভক্তের বাসনা পূর্ণ করার জন্য স্বয়ং ভগবতী কন্যা হয়ে রণজিৎ রায়ের ঘরে জন্মেছিলেন। কথামৃতে রয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ''তপস্যার জোরে নারায়ণ সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ও-দেশে যাবার রাস্তায় রণজিত রায়ের দীঘি আছে। রণজিত রায়ের ঘরে ভগবতী কন্যা হয়ে জন্মেছিলেন।... রণজিত রায় ওখানকার জমিদার ছিল। তপস্যার জোরে তাঁকে কন্যারূপে পেয়েছিল। মেয়েটিকে বড়ই স্নেহ করে। সেই স্নেহের গুণে তিনি আটকে ছিলেন, বাপের কাছ ছাড়া প্রায় হতেন না। একদিন সে জমিদারির কাজ করছে, ভারী ব্যস্ত; মেয়েটি ছেলের স্বভাবে কেবল বলছে, 'বাবা, এটা কি; ওটা কি।' বাপ অনেক মিষ্টি করে বললে—'মা, এখন যাও, বড় কাজ পড়েছে।' মেয়ে কোনমতে যায় না। শেষে বাপ অন্যমনস্ক হয়ে বললে, 'তুই এখান থেকে দূর হ'। মা তখন এই ছুতো করে বাড়ি থেকে চলে গেলেন। সেই সময় একজন শাঁখারী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে শাঁখা পরা হল। দাম দেবার কথায় বললেন, ঘরের অমুক কুলুঙ্গিতে টাকা আছে, লবে। এই বলে সেখান থেকে চলে গেলেন, আর দেখা গেল না। এদিকে শাঁখারী টাকার জন্য ডাকাডাকি করছে। তখন মেয়ে বাড়িতে নাই দেখে সকলে ছুটে এল। রণজিত রায় নানাস্থানে লোক পাঠালে সন্ধান করবার জন্য। শাঁখারীর টাকা ঠিক সেই কুলুঙ্গিতে পাওয়া গেল। রণজিত রায় কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় লোকজন এসে বললে যে, দীঘিতে কি দেখা যাচ্ছে। সকলে দীঘির ধারে গিয়ে দেখে যে শাঁখাপরা হাতটি জলের উপর তুলেছেন। তারপর আর দেখা গেল না। এখনও ভগবতীর পূজা ওই মেলার সময় হয়—বারুণীর দিনে।... এ সব সত্য।''[৪]

কথিত আছে, রামকৃষ্ণদেব রণজিৎ রায়ের দিঘি দর্শন করেছিলেন। শ্রীশ্রীমা এক বছর বারুণী উপলক্ষ্যে এই দিঘিতে স্নান করেছিলেন। নিকটস্থ বিক্রমপুরে আছে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির। রণজিৎ রায় বিশালাক্ষী মাতার পূজক ছিলেন। শ্রীশ্রীমা এই বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরও দর্শন করেছিলেন। কথামৃতকার শ্রীম কামারপুকুর দর্শনে এসে রণজিৎ রায়ের পুকুর দর্শন করেছিলেন।[৫]

রণজিৎ রায়ের দিঘি

গৌরহাটি গ্রামের কাছাকাছি রয়েছে সারাটি-মায়াপুর—শ্রীরামকৃষ্ণের মাতুলালয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অন্তত একবার মায়ের সঙ্গে এখানে এসেছিলেন। পুরনোদিনের বাড়ির আদলে চন্দ্রমণি দেবীর বাস্তুভিটায় একটি মাটির বাড়ি রয়েছে। বিভিন্ন সেবাকাজ ও ভাবপ্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে এখানে গড়ে উঠেছে শ্রীরামকৃষ্ণ চন্দ্রমণি সেবাশ্রম। রয়েছে সুন্দর মন্দির। ২০১৭ সালের ১৯ নভেম্বর মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছিলেন মঠ-মিশনের

সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। মন্দিরে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর পট ছাড়াও একপাশে শিশু গদাইকে কোলে নিয়ে চন্দ্রমণি দেবীর চিত্রও রয়েছে। তিনিও এখানে পূজা পান।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তেলোভেলোর মাঠ কাছাকাছি। একসময় যা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ আর ভয়ংকর ডাকাতদের রাজত্ব, তা এখন পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। ১২৮০ সালের অল্প কিছু সময় আগে-পরে সারদা দেবী কামারপুকুর থেকে হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার পথে ডাকাতদের কবলে পড়েন। তাঁকে ডাকাতরা কালীরূপে দর্শন করেছিল। পরবর্তী কালে তেলুয়া গ্রামে এবং দেড় কিমি দূরে ভালিয়া গ্রামেও স্থাপিত হয়েছে শ্রীমা সারদার মন্দির। ভালিয়াতে রয়েছে 'ডাকাতে কালী'র মন্দির, যে-মন্দিরে পুজো দিয়ে ডাকাতরা ডাকাতি করতে বেরুত।

গৌরহাটি মঠ থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে বালি-দেওয়ানগঞ্জ। বালি এবং দেওয়ানগঞ্জ দুটি আলাদা আলাদা স্থান হলেও একসঙ্গে উচ্চারিত হয়। পাশাপাশিই এদের অবস্থান, সঙ্গে জুড়ে গেছে রাধাবল্লভপুর। ১৮৮০ সালে রামকৃষ্ণদেব, সারদা দেবী এবং রামকৃষ্ণদেবের ভাগ্নে হৃদয় দক্ষিণেশ্বর থেকে শিহড় যাওয়ার পথে দেওয়ানগঞ্জ তথা রাধাবল্লভপুরে বুড়োশিবতলায় বংশীধর মোদকের নতুন বাড়িতে তিন দিন ছিলেন। প্রবল বৃষ্টির দরুন তাঁরা আটকে পড়েছিলেন। পরবর্তী কালে এই বাড়িটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের সদস্য সংগঠন রাধাবল্লভপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘের অধীনে আসে; এখানে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর পট স্থাপন করে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। বাড়িটির কাছাকাছি স্থান সংকুলান না হওয়ায় একটু দূরেই স্থাপিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির। এই সেবাসঙ্ঘের উদ্যোগেই আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষদের উন্নতিসাধনে গড়ে উঠেছে বালি সারদা পল্লী সেবা সংস্থা। নারী-পুরুষ মিলিয়ে বর্তমানে ষাট জন এখানে কাজ করেন। তৈরি হয় মধু, ঘি, ধূপকাঠি, তাঁতবস্ত্র, উল ও পাটের বিভিন্ন সামগ্রী। তাছাড়া এখানে রয়েছে একটি বৃহৎ আকারের ফ্রি কোচিং সেন্টার।

আর একটি দর্শনীয় স্থান খানাকুলের বন্দর। এটি একটি নদীঘাট। গৌরহাটির দক্ষিণে বারো কিলোমিটার দূরে রূপনারায়ণ নদের তীরে বন্দর, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা ও ভাগ্নে হৃদয়কে নিয়ে কলকাতা থেকে এসেছিলেন জলপথে।[৬]

গৌরহাটির নিকটস্থ উবিদপুর গ্রামে কানা দ্বারকেশ্বরের তীরে আছে বহু পুরনো ঘণ্টেশ্বর শিবমন্দির। বন্যায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তৎকালীন স্থানীয় জমিদার বিপিনবিহারী সিনহা বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করে দিয়েছেন। ভারতের নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান খানাকুলের রাধানগর গ্রাম ও নিকটস্থ রঘুনাথপুরে তাঁর বসতবাটী গৌরহাটি থেকে বারো কিলোমিটার দূরে। ২০২২ সালের মে মাসে রামমোহন রায়ের জন্মের ২৫০তম বর্ষপূর্তিতে এই দুটি স্থানকেই হেরিটেজ ঘোষণা করা হয়েছে।

রাজা রামমোহন নাঙ্গুলপাড়ার মাতৃনিবাস থেকে বিতাড়িত হয়ে ১৮১৭ সালে রঘুনাথপুরে একটি বাড়ি করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী উমাদেবী এখানে থাকতেন। রামমোহন মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে আসতেন। সেই বাড়ির এখন শুধু চারপাশের দেওয়ালগুলি দাঁড়িয়ে আছে। এখানে সিমেন্টে বাঁধানো একটি বেদি পরবর্তী কালে নির্মিত হয়েছে। সেটি সতীদাহ বেদি, ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন এখানে দাঁড়িয়েই সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন ২০০১-এর আইন অনুযায়ী এই স্থানটিকে ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দিয়েছে। ফিরতি পথে সামনেই পড়বে রাধানগর, যেখানে ১৭৭২ সালের ২২ মে

ঘণ্টেশ্বর মন্দির

রামমোহন রায়ের জন্ম হয়েছিল। এখানে নির্মিত হয়েছে স্মারক ভবন। ভবনটির নকশা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনটি শিখর বিশিষ্ট ভবনের একটি শিখর মন্দির, একটি মসজিদ ও একটি গির্জা—তিন ধর্মের ঐক্যের প্রতীক। ১৯১৬ সালে ভবনটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদের কন্যা চন্দ্রজ্যোতির কন্যা হেমলতা দেবী, যিনি আবার অন্যদিকে ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ।

খানাকুল থানার অধীন উবিদপুর গ্রামে কানা দ্বারকেশ্বর নদ, যা এখন মজে খালের রূপ নিয়েছে, তার তীরে ঘণ্টেশ্বর মন্দির। সুন্দর মন্দিরের গর্ভগৃহে রয়েছেন স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ। আনুমানিক প্রায় ছশো বছর আগে দেবমূর্তির প্রকাশ ও মন্দিরের নির্মাণ হয়। একবার বন্যায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর ১৯৪৩ সালের কিছু পূর্বে জমিদার বিপিনবিহারী সিনহা বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন। চৈত্রমাসে এখানকার গাজন খুব বিখ্যাত। সমগ্র হুগলি জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ সেইসময় ভিড় করেন। পাঁচদিন ব্যাপী মেলার সংক্রান্তির দিন হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়। শিবরাত্রি এবং নীলপূজাও উৎসবের চেহারা নেয়। এখানে রথযাত্রাও হয়ে থাকে। ঘণ্টেশ্বর মন্দিরের পাশেই অন্যান্য মন্দিরে দেবী দুর্গা, মা বিশালাক্ষী, অন্নপূর্ণা, মা ষষ্ঠী, ধর্মরাজ, রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ, গৌরনিতাই, মা আনন্দময়ী শ্মশানকালী প্রভৃতি দেবদেবীরা রয়েছেন।

এই মন্দির চত্বরের একপাশে রয়েছে দেবী রত্নাবলীর মন্দির। কুমারীদেবী কালী বা দেবী রত্নাবলীর সন্ধান পেয়েছিলেন স্বরূপনারায়ণ ব্রহ্মচারী নামে এক সাধক। স্থানীয়দের বিশ্বাস এটি একটি সতীপীঠ। এখানে দেবীর ডান স্কন্ধ পড়েছিল বলে মন্দিরগাত্রেও উল্লেখ রয়েছে। জানা যায়, সাধক স্বরূপনারায়ণ স্বপ্নাদেশ পেয়ে মায়ের শিলামূর্তির সন্ধান পান। পরে মায়ের মূর্তি তৈরি করে পূজা করতে থাকেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী এই শ্মশানকালীক্ষেত্রে প্রায়ই আসতেন। সম্প্রতি এই মন্দিরের সংস্কার করে নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে। মন্দিরগুলির একপাশে কানা দ্বারকেশ্বর বা রত্নাকর নদী আর তার পাশেই মহাশ্মশান।

কৃষ্ণনগরের গোপীনাথজীউ-এর মন্দির আর এক দর্শনীয় স্থান। কথিত, দ্বাপর যুগের কৃষ্ণসখা শ্রীদাম, পঞ্চদশ শতকে অভিরাম গোস্বামী রূপে আবির্ভূত হন। তিনি বৈষ্ণবধর্মের প্রচারকল্পে এই অনিন্দ্যসুন্দর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ষোলো জন বলশালী লোক মিলে যে কাঠের গুঁড়ি তুলতে পারত না, খানাকুল-কৃষ্ণনগরের গোপাল অভিরাম গোঁসাই তা একাই তুলে বাঁশি বাজানোর ভঙ্গি করতেন। ত্রিতল এই মন্দিরটিতে গোপীনাথের মূর্তি ছাড়াও বলরাম, মদনমোহন ও অভিরাম গোস্বামীর মূর্তি আছে। প্রভু অভিরাম প্রতিষ্ঠিত পাঁচশো বছরের পুরনো বকুলকুঞ্জ এখনও বর্তমান। সবসময় গাছটিতে ফুল ফুটে থাকে, কিন্তু ফল দেখা যায় না। অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র রায় এখানে কিছুদিন বাস করেছিলেন।

বকুলতলা থেকে উত্তরদিকে একটু এগিয়ে গেলেই আর একটি মন্দির প্রাচীন স্থাপত্যশিল্পের এক অপরূপ নিদর্শন। এটি রাধাবল্লভজীউ-এর

রাধাবল্লভ মন্দির

মন্দির। মন্দিরগাত্রে অতিসুন্দর টেরাকোটার কাজ। মন্দির নির্মাণ শুরু করেছিলেন খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজের প্রতিষ্ঠাতা যাদবেন্দ্র সিংহরায়চৌধুরী। তাঁর পুত্র কৃষ্ণরাম মন্দির সম্পূর্ণ করে মন্দিরে রাধাকান্ত ও রাধাবল্লভের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক বছর আগে রাধাকান্তের মূর্তিটি চুরি হয়ে যায়।

রাধানগর থেকে খানাকুলের দিকে এগোলে পড়বে কোটরা গ্রাম। এই গ্রামের বাইরে চারপাশে চাষজমির মাঝে একটু উঁচু স্থানে জীর্ণ এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে পরপর ছয়টি শিবমন্দির। আসলে এই উঁচু স্থানটি রত্নাকর নদীর তীর, নদীতীরে মন্দিরগুলি স্থাপিত হয়েছিল। নদীটি অধুনা লুপ্ত। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরে পোড়ামাটির ফলকে লেখা রয়েছে সন ১১৯৬ অর্থাৎ মন্দিরগুলি দুশো চৌত্রিশ বছরের পুরনো। স্থানীয় জমিদার নীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক পূর্বপুরুষ সাতটি বিয়ে করেছিলেন। প্রথম স্ত্রীর জন্য প্রথমে পুকুর পাড়ে একটি শিবমন্দির নির্মাণ করান। পরে তিনি আরও ছয়টি বিয়ে করেন এবং পত্নীদের প্রত্যেকের জন্য এক সারিতে একইরকমের ছয়টি শিবমন্দির তৈরি করান। প্রতিটি মন্দিরের দেওয়ালের নিচের দিকে একটি গর্ত রয়েছে। গর্তের অবস্থান এমনভাবে যে, মন্দিরগুলি পরপর সারিবদ্ধভাবে থাকায় প্রথম মন্দিরের গর্তে চোখ রাখলে ছয়টি মন্দিরের ছয়টি শিবলিঙ্গ দেখা যায়। বর্তমানে শিবলিঙ্গগুলি মন্দিরে থাকে না। বংশধরেরা এগুলিকে আরাধ্য দেবতা হিসাবে নিজেদের বাসস্থান সংলগ্ন মন্দিরে স্থাপন করেছেন বলে জানা যায়।

রামকৃষ্ণ মঠ, গৌরহাটিকে কেন্দ্র করে এইসব পবিত্র ও দর্শনীয় স্থানগুলিকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত এক ভ্রমণ হতেই পারে। শান্ত গ্রামীণ পরিবেশে এই মঠে আছে ফুল, ফল ও সবজি বাগান, দুটি পুকুর, দ্বিতল অতিথিভবন। জয়রামবাটী-কামারপুকুর গেলে সাধারণত কোয়ালপাড়া, শিহড়, আনুড়, দেরেপুর দর্শন হয়, তার সঙ্গে এবার গৌরহাটি মঠ এবং আশপাশের এসব স্থানও যুক্ত হয়ে যেতে পারে।

তথ্যসূত্র

১। স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০০, ভাগ ১, পূর্বকথা ও বাল্যজীবন, পৃঃ ৬০

২। শ্রীম-কথিত, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, অখণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১, পৃঃ ১২৭৯ [এরপর, *কথামৃত*]

৩। উদ্বোধন পত্রিকা, বৈশাখ ১৪৩০, পৃঃ ৬৬

৪। *কথামৃত*, পৃঃ ৮৫৬

৫। দ্রঃ দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার কামারপুকুর-জয়রামবাটী*, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা গবেষণা কেন্দ্র, বেঙ্গাই, ২০১৬, পৃঃ ৮৭

৬। দ্রঃ ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য, *ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ*, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৪১৫, পৃঃ ১৮৬

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : গৌরহাটি আশ্রমের স্বামী প্রাণারামানন্দ, রাধাবল্লভপুরের স্বামী সুনিষ্ঠানন্দ, গৌরহাটির ড. মন্টু কুন্ডু, শক্তিপদ দাস, রামদাস মুখার্জি, হিমাদ্রিশেখর চ্যাটার্জি, বালির অসীম দত্ত।